আইভ্যান পেট্রোভিচ পাভ্‌লভ

কৃষ্ণা রায়

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ প্রাক্‌কথন ॥

রাশিয়ার বিজ্ঞানী পাভ্‌লভ-কে চেনেন না এমন শিক্ষিত মানুষ কমই আছেন। ছোটোবেলায়, পাঠ্যবইতে কুকুরের মুখের সামনে মাংসের টুকরো রাখা আর ঘণ্টা বাজানোর পরীক্ষাটি সবাই পড়েছেন। চেনা খাবার-জিনিস মুখের সামনে ধরা হলে প্রাণীর মুখ থেকে লালাক্ষরণ হবে। এটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনার সঙ্গে অপর একটি সম্পর্কহীন শর্ত যদি বার বার জুড়ে দেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে— কিছুদিন পর ওই শর্তটি স্বনির্ভরতায় লালাক্ষরণ ঘটাতে পারে। তখন খাবার জিনিস মুখের সামনে ধরে দেওয়ার দরকার হয় না। পাভ্‌লভের পরীক্ষায় এই শর্তটি ছিল ঘণ্টার শব্দ। এ ঘটনাটিকে পাভ্‌লভ নাম দিয়েছিলেন শর্তাধীন প্রতিবর্ত-ক্রিয়া বা conditioned reflex। এই বৈজ্ঞানিক ঘটনাটির যথেষ্ট পরিচিতি থাকলেও গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাভ্‌লভ শারীরবিদ্যা ও মেডিসিনে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন প্রাণীদেহে পাচকরস ক্ষরণ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করার জন্য।

বিদেশে একাধিক ব্যক্তি পাভ্‌লভের জীবনী রচনা করেছেন। তার কারণ, শুধুমাত্র এক নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানীর যাপিত জীবনে ক্ষণ মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত নয়। নোবেল প্রাইজ তো একশো বছরের বেশি সময় ধরে একাধিক বিজ্ঞানী পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সবার জীবন কি এতই মনোযোগ

দাবি করে? আসলে পাভ্‌লভের জীবন মানেই আমরণ এক নির্ভীক-লড়াকু, সৎ মানুষের দিনচর্যার ইতিহাস। কাঁটা-বিছোনো পথে হতাশা আর অন্তহীন সংগ্রামে পথ হাঁটতে হাঁটতে যে মানুষটি জীবনে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। সে লক্ষ্য আর কিছুই নয়, বিজ্ঞানের সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গলসাধন।

পাভ্‌লভের মানসিক কাঠামো এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও শেষভাগের জার-শাসিত রাশিয়া। পাভ্‌লভের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শাসনকালে। দেশে তখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদল ঘটছে। রাশিয়ার যুবশক্তি দেশপ্রেমের আদর্শে মাতোয়ারা। সে আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে পাভ্‌লভের জীবনদর্শনেও। চিরকাল সত্য, ন্যায়, মুক্তি ও বিজ্ঞানের সাধনায় আশ্চর্যজনক ভাবে স্থিত ছিলেন তিনি। জার-শাসিত রাশিয়া থেকে শুরু করে লেনিন-স্তালিন শাসিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায় যখনই অন্যায় দেখেছেন, অসংকোচে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তীব্র ভাষায়। রাশিয়ার তৎকালীন কর্ণধারেরা, বিশেষত লেনিন বা স্তালিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কঠোর সমালোচনা সেখানে বিরূপতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেনি। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে, ১৯৪১ সালে স্তালিন পাভ্‌লভকে, রাশিয়ায় খ্যাতি এনে দেওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সারাজীবন মানুষটি শারীরবিদ্যার গবেষণায় মেতে ছিলেন। সে সব গবেষণার কাজের মধ্যে একটি যোগসূত্র বরাবর রয়ে

গেছে। সেটি হল শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে স্নায়ু বা নার্ভের ভূমিকা। প্রথম জীবনে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় ছিল প্রাণী দেহে রক্ত চলাচল প্রক্রিয়ায় স্নায়ুর ভূমিকা। মধ্যজীবনে মেতে উঠেছিলেন প্রাণী দেহে বিভিন্ন পাচক রস ক্ষরণ সম্পর্কে গবেষণায়, সেখানেও স্নায়ুর ভূমিকা খুঁজেছিলেন। আর এই ভূমিকা খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কৃত হল কনডিশন্ড-রিফ্লেক্স-এর মতো ঘটনা। জীবনের শেষ পর্যায়ে পাভ্লভ বিস্তৃত গবেষণা করেছেন প্রাণীর ব্যক্তিত্ব ও স্নায়ুজ-বিকার সম্পর্কে।

পাভ্লভের গবেষণার পথরেখা ছুঁয়ে রাশিয়া শারীরবিদ্যা তথা physiology গবেষণার তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বস্তুত জীববিজ্ঞানের সঙ্গে মেডিসিনের গবেষণাকে যুক্ত করে নতুন এক বৈজ্ঞানিক সাধনার ধারা সৃষ্টি করেন পাভ্লভ। বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমেই মানবজাতির উন্নতি ঘটবে-এ বোধ আজীবন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। জনদরদি, দেশপ্রেমিক, সাহিত্য—সংস্কৃতি অনুরাগী, এক নাস্তিক বিজ্ঞানীর জীবন আমাদের একটি সহজ সত্যের স্বাদ চেনায়—দৃঢ়বদ্ধ প্রতিজ্ঞা আর কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়েই একটি মানুষ জনকল্যাণে ব্রতী হতে পারেন, আরোহণ করতে পারেন অসাধারণত্বের শিখরে।

পাভ্লভের জীবন যেহেতু এক বিজ্ঞান-সাধকের জীবন, তাই এ লেখায় বারে বারে কিছু বিজ্ঞান-বিষয়ক বিশেষত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই উল্লেখ অনিবার্য ছিল। এ বিষয়ে বোধ্যতা তৈরি করার আগ্রহ স্বয়ং এই লেখকের, না হলে পুরো বিষয়টিই পাঠকের

বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। এ কারণেই শব্দগুলির ব্যবহারিক অর্থ স্থানে স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষা দুই-ই ব্যবহার করা হয়েছে। সবই অবশ্য জীবনী ভাষ্যের স্বাদ তৈরি করার তাগিদে।

গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে সাহায্য পেয়েছি বিভিন্ন অধ্যাপক বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীর। তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই; আর যাঁর উৎসাহ ও তাগাদা ছাড়া এ জীবনী লেখা অসমাপ্ত-ই হয়তো রয়ে যেত, তিনি পুনশ্চ-প্রকাশনার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক, শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাঁর অবদানকে মর্যাদা দেওয়া যায় না।

কৃষ্ণা রায়
রিডার, শারীরবিদ্যা বিভাগ,
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

Science demands from a man
all his life. If you had two
lives that would not be enough
for you. Be passionate in your
work and in your searching.

আইভ্যান পেট্রোভিচ পাভ্‌লভ

সূচিপত্র

বাল্য ও কৈশোর	১৩
উচ্চশিক্ষা	২০
কর্মজীবন ও সাধনা	২৭
সাধনার স্বীকৃতি	৫১
বিজ্ঞানীর দিনযাপন	৫৭
ছায়া সঙ্গিনী	৬২
বিজ্ঞানীর অন্তর মহল	৭৩
সায়াহ্নের দিনগুলি	৯৩
পরিশিষ্ট	১০০

॥ বাল্য ও কৈশোর ॥

ছেলেটার নাম আইভ্যান। পুরো নাম আইভ্যান পেট্রোভিচ পাভ্‌লভ। রাশিয়ার ছোট্ট একটা শহরের ধর্মযাজক পিটার দিমিত্রিভিচ পাভ্‌লভের বড়ো ছেলে। জায়গাটাকে শহর না বলে গ্রাম বললেও দোষের হয় না। রাশিয়ার মস্কো শহর থেকে একশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে সেই আধা-শহর রায়াজান (Ryazan)। পাভ্‌লভ-পরিবারে রোজগারের উৎস হল পিটার দিমিত্রিভিচের পুরোহিতবৃত্তি। স্থানীয় গির্জার পুরোহিত তিনি। পাভ্‌লভের ঠাকুরদা-ও ছিলেন রায়াজানের গ্রাম্য গির্জার তত্ত্বাবধায়ক। গির্জার বাগানে কবর খোঁড়া থেকে শুরু করে গির্জায় ঘণ্টা বাজানোর কাজ— সবই তাঁকে করতে হত। পরিবারে সবাই খুব ধর্মভীরু। আইভ্যানের মা-ও এক ধর্মযাজকের কন্যা। একে ছোটো শহর, তায় স্থানীয় গির্জার পুরোহিত-বৃত্তি, পিটার দিমিত্রিভিচের তাই সংসারে আয় যৎসামান্য। অতি কষ্টে দিন চলে। সে যুগে রাশিয়া ছিল কৃষি-প্রধান দেশ। সমাজে পুরোহিত-বংশের লোকের স্বতন্ত্র ও

সম্ভ্রান্ত অবস্থান থাকলেও গ্রাম্য পুরোহিতেরা চাষ-আবাদ করতেন গির্জার জমিতে। আর তাদের প্রতিপালন করতে হত বিরাট পরিবার। ফলে বৃষ্টি, বন্যা, তুষারপাত, খরা, ফসলের অপ্রাচুর্য, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা, রোগ-জর্জর সন্তানের পরিচর্যা সবই তাদের জীবনে ভীষণ সাধারণ ঘটনা ছিল। আবার মেধা-চর্চা ও বিদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি অক্লান্ত পরিশ্রমের অভ্যাস তাদের শরীর-স্বাস্থ্য মজবুত করে তুলত। আইভ্যানের বাবা পিটার দিমিত্রিভিচের জীবনও অন্য রকম কিছু ছিল না। তিনিও জমিজমা ভালোবাসতেন; ফল-বাগিচা ও সবজি-খেতে কাজ করতেন, ভালোবাসতেন বইপত্র। এগারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। এদের মধ্যে ছ'টি মারা গেছে খুব অল্প বয়সে, সংক্রামক রোগে। বেঁচে রইল চার ছেলে ও এক মেয়ে। আইভ্যানের মা ভার্ভারা- আইভানোভনা এই এগারোটি সন্তানের জন্ম এবং তাদের লালনপালনের ভারে প্রায় পঙ্গু। আইভ্যানের অন্য তিন ভাই-এর নাম দিমিত্রি, পিটার আর সের্গেই। বোনের নাম লিডিয়া। সে যুগের রাশিয়ার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আইভ্যান জন্মেছে ১৮৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আর পশ্চিম-ইউরোপের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তার জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার চেয়ে বড়ো সে।

গির্জার পুরোহিতের ছেলে বড়ো হয়ে পুরোহিত হবে, এমনটি সবার আশা। সাত বছর বয়সে, আইভ্যানকে তাই ভরতি করা হল স্থানীয় গির্জার অধীনস্থ স্কুলে। কিন্তু নয় বছর বয়সে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় পড়ে ভীষণ জখম হল আইভ্যান। বেড়া ভেঙে ইঁটের শক্ত মেঝেতে পড়ে গিয়ে বেচারা ঘরবন্দি হয়ে রইল। পাঁজরে চোট, ফুসফুসও বুঝি

কমজোরি হয়ে পড়েছে। অতএব স্কুলে যাওয়া বন্ধ। এ সময়ে তার জীবনে দেবদূতের মতো হয়ে এলেন রায়াজানের খুব কাছে এক মনাস্টারির (সেন্ট ট্রিনিটির মনাস্টারি) 'অ্যাবট'*। সুপণ্ডিত, অসাধারণ মানব-দরদি এক মানুষ। দুর্ঘটনায় আহত বালকটির দুর্দশা দেখে তিনি তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। ভালো খাবার, মুক্ত বাতাস আর অল্পস্বল্প ব্যায়ামে উৎসাহ দিয়ে ছেলেটিকে সুস্থ করে তুললেন। বিনিময়ে বালক আইভ্যান তাঁর বাগানে কাজ করে, তাঁর শেখানো বিষয় প্রাণ দিয়ে মেনে চলার চেষ্টা করে। অ্যাবট খুব পরিশ্রমী। সারাদিন এটা-ওটা কাজে ব্যস্ত থাকেন, পড়াশুনো করেন অনেক রাত অব্দি। মাঝরাতে, ঘুম ভেঙে গেলে বালক আইভ্যান অবাক হয়ে দেখে অ্যাবট ডেস্কের সামনে বসে বই পড়ছেন। পরবর্তী কালে, এই অভিজ্ঞতা আইভ্যানের সারাজীবনের শুধু স্মৃতি হয়েই ওঠেনি, নিজের জীবনেও একে কাজে লাগিয়েছেন। অদ্ভুত লোক এই অ্যাবট। বালকটিকে গল্পের বই পড়ে শোনান। ঘরবন্দি ছেলেটির মনের ক্রমিক বিকাশের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি তাকে ক্রাইভের রূপকথার বইটির উপহার দিলেন। রাশিয়ার সাহিত্যে এই বইটি ভীষণ জনপ্রিয়। আইভ্যানের খুব পছন্দ হয়ে যায় বইটি। বার বার পড়তে পড়তে গোটা বইটাই মুখস্থ হয়ে যায়। সে শুধু নিজেই পড়ে না, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব্বাইকে পড়েও শোনায়। অগত্যা, অ্যাবট তাকে একটি খাতা দিয়ে বললেন, এভাবে নয়, রোজ তুমি যা পড়বে

---

* অ্যাবট (abbot) - খ্রিস্ট সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের প্রাচীন মঠ বা আশ্রম সংলগ্ন গির্জার (অ্যাবি - abbey) অধ্যক্ষ।

এই বই থেকে, সেসব এ খাতায় লিখে রেখো, আমি পরে দেখব। অ্যাবট আরও উৎসাহ দিয়ে বললেন, দেখো, এভাবেই তোমার নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটবে, পড়া বিষয়গুলো চটপট মাথায় এমন ঢুকে যাবে যে-কোনো ভাবেই সেসব ভোলা সম্ভব হবে না। তোমার মনের মধ্যে যুক্তি-বোধও ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এরই মাধ্যমে।

অ্যাবট ছিলেন আইভ্যানের জীবনে গড-ফাদার। তাঁর এই শিক্ষা সারা জীবন ধরে আইভ্যান বয়ে বেড়িয়েছে। যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে নিয়মানুগ পর্যবেক্ষণ তার জীবন-যাপনের অংশ হয়ে উঠেছিল।

১৮৬২ সালে, প্রায় তেরো বছর বয়স (মতান্তর ১১ বছর) থেকে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করল আইভ্যান। স্কুলের নাম 'রায়াজান এক্লেসিয়াস্‌টিক্যাল হাই স্কুল'। সে ভর্তি হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। বালক আইভ্যান পড়তে খুব ভালোবাসে। পনেরো বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করে সে ভর্তি হল থিয়োলজিক্যাল সেমিনারিতে। সেখানে পুরোহিত হওয়ার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গোঁড়া ধর্মযাজকের ছেলের জীবনে এ ছাড়া আর উপায় কী? বাবার পেশা অনুসরণ করতে হলে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো তো করতেই হবে। সেমিনারির পড়াশুনো পদ্ধতিটি বেশ অন্যরকম। তরুণ শিক্ষকেরা এখানে পড়ান। সাধারণ মেধার ছাত্রের তুলনায় অসাধারণ মেধার ছাত্রদের বেশি বেশি উৎসাহ দেওয়া হয়; কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে কোনো ছাত্রের পারদর্শিতা চোখে পড়লে অন্য বিষয়ে তার অজ্ঞতা বা জ্ঞানের দৈন্যতা ক্ষমার চোখে দেখা হত। সে সময় রাশিয়ায় স্বৈরাচারী সম্রাট (জার) প্রথম নিকোলাস-এর রাজত্বের অবসান ঘটেছে। তাঁর ছেলে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার

যথেষ্ট উদার মনোভাবাপন্ন। ছাত্ররা তখন পড়াশুনোর বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা পায়। আসলে, ১৮৬০ এর দশকে রাশিয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদল শুরু হয়েছে। দেখা দিয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার নেতৃত্বে রয়েছেন তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়ের মতো সাহিত্যিকেরা। পশ্চিম পৃথিবী তথা পাশ্চাত্যের ধারণা, বিজ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে রাশিয়ার জনমানস সচেতন হয়ে উঠছে। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তখন বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায়। দেশের সমকালীন বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আলোচনা হয়, তর্ক হয়। আইভ্যান খুব পছন্দ করে যুক্তি সাজিয়ে সাজিয়ে তর্ক করতে, যাতে প্রতিপক্ষ মুখ-খোলার সুযোগ না পায়।

থিয়োলজিক্যাল সেমিনারিতে তাকে পাঠ নিতে হয় ধর্মচর্চা, ভাষা-শিক্ষা, দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের। এই সব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ আইভ্যান ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গভীরতর পাঠে। ইতিমধ্যে সে পড়ে ফেলেছে রাশিয়ার শরীরতত্ত্ববিদ্যার জনক আই.এম.সেচেনভ-এর গবেষণার কাজ। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত এই গবেষণার বিষয় ছিল মস্তিষ্কের প্রতিবর্ত-ক্রিয়া* (Reflexes of brain)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ-হেনরি লিউইস-এর লেখা বই 'দ্য ফিজিওলজি অফ কমন লাইফ' পড়ে সে মুগ্ধ। বইয়ের ভেতরে প্রাণীর পৌষ্টিক-তন্ত্রের ছবিটি তাকে ভীষণ টানে। বিখ্যাত ফরাসি শারীরতত্ত্ববিদ ক্লদ-বার্নাড এর গবেষেণার ওপর ভিত্তি করে আঁকা সেই ছবিটির খুঁটিনাটি তাকে ক্রমশ

---

* প্রতিবর্ত-ক্রিয়া : এটি এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া যা প্রাণীদেহের স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা প্রয়োগের ফলে দেখা যায়।